সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বা Socialist Realism

প্রসূন ঘোষ

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ও যথাস্থিতবাদ- উভয়ই হল বাস্তববাদেরই দুটি ভাগ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। রাশিয়ার প্রাভদায় প্রথম এই বিষয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের কথা বলা হয়। সোভিয়েত লেখকগোষ্ঠীর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ম্যাক্সিম গোর্কি।সেখানে রাজনৈতিক প্রচার ধর্মী সাহিত্য ও বিচারধর্মী বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।জানানো হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা জনমানুষের চেতনাকে জাগ্রত করবে এবং এই বাস্তবতা হবে বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,এই সাহিত্য সামগ্রিক মানবতাবাদের বিরোধী, এই সাহিত্য সর্বহারার জন্য নিয়োজিত নয়। এই সাহিত্যের জন্ম ফিউডালিস্ট বা সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গি থেকে।বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা,অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ,নৈরাজ্যবাদ, কলাকৈবল্যবাদ, প্রভুত্ববাদ, পরাজিত মনোভঙ্গি,বিষাদচেতনা থেকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের জন্ম হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের বিরোধিতার জন্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উত্থান।এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূলত তিনটি দিক,- যথা (i) socialist content (ii) natural form (iii)realistic representation। অর্থাৎ , সাম্যবাদী বিষয়বস্তু, জাতীয়তাবাদী গঠনকৌশল ও বাস্তববাদী উপস্থাপনা- এই ত্রি-সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে বলা হয়, এখানে বাঁচাতে হবে সাম্যবাদী সত্যকে। এখানে বলা হয় সাম্যবাদী সত্য ও বিশ্বাসকে জাতীয় জীবনে ভিত্তি করে বস্তুবাদী সাহিত্য রচনা করতে হবে।সচেতন থাকতে হবে ছদ্মবেশী শত্রু সম্বন্ধে,যেখানে অতি বিপ্লবের বাণী উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলে। পুনর্জীবন দিতে হবে সেইসব সাহিত্যকে যা দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসছে। সেই জন্য সোভিয়েতে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় পুশকিন,টলস্টয়,তুর্গেনিভ,গোগোল লেখক বর্গকে,যাঁরা জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে নানাভাবে বহন করে চলেছেন। তাঁরা আবার এই সমস্ত লেখকদের আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হন, যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য,কলাকৈবল্যবাদ, প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে লেখনী চালনা করে চলেছেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লেনিন *'পার্টি অরগানাইজেশন এন্ড পার্টি লিটারেচার'* নামে একটি রচনা লেখেন এবং তাতে লেখকদের আহ্বান জানানো হয়।তাঁরা যেন বৈপ্লবিক কাজ কর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজ ও শিল্পের মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেন।সর্বহারার জন্য নিয়োজিত শিল্পের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের রক্ষণশীলতার বিরোধিতা করেন এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা। টলস্টয় যে রাষ্ট্রবিপ্লব নিয়ে দর্শন রচনা করেছিলেন তার কথা বলেন।তাঁরা সর্বদা বুর্জোয়াদের পক্ষপাত থেকে বেরিয়ে এসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শে সাহিত্য রচনা করতে বলেন।

এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা তুলে ধরেন টলস্টয়,লারমেন্টভ প্রমুখ কীভাবে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছেন ।তাঁরা বলেন সেই আদর্শেই ঐতিহ্যের পুনরুত্থান ঘটাতে হবে তাঁদের।এই বাস্তবতা হবে জনগণের বাস্তবতা।জনগণ পৃথিবীর সম্পদ।তাঁরাই সমাজ পুনর্গঠন করে। এক্ষেত্রে বলা হয় সাহিত্যিকের চোখ থাকবে ভবিষ্যতের দিকে, যাঁরা অতীতকে পুনর্গঠন করবেন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। তাঁরা অতীত মোহে আবদ্ধ থাকবেন না, তাঁরা অতীতকে পুনরুদ্ধার করবেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে লক্ষ রেখে ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ।সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষা করে সাহিত্য রচনা করার কথা বলা হয় এখানে।

বাংলা সাহিত্যেও প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আদর্শে সাহিত্য রচনা করেন।এ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত ছিল যে, কল্লোল যুগের লেখকেরা একদিকে ন্যুট হামসুন এবং অন্যদিকে ম্যাক্সিম গোর্কি-

দু'জনকেই মেলাতে চাইছেন।মানিকের প্রশ্ন,প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সাহিত্যে ন্যুট হামসুন এবং ম্যাক্সিম গোর্কিকে মেলানোর কথা বলছেন কীভাবে?আসলে ন্যুট হামসুন,জোহান বোয়ার প্রমুখের রচনায় ন্যাচারালিজমের রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায়।ন্যাচারালিজম বা যথাস্থিতবাদের মূলকথা হল মানুষ জৈবক্ষুধা তাড়িত উন্নত এক জীব। এই স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সাহিত্যিক ন্যুট হামসুনের অনূদিত বিখ্যাত একটি উপন্যাস *ক্ষুধা*-র দ্বারা প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভাবিত হন। পক্ষান্তরে ম্যাক্সিম গোর্কির *মাদার* উপন্যাসও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে তাঁকে। প্রকৃতঅর্থে,ন্যুট হামসুন প্রকৃতিবাদ এবং ম্যাক্সিম গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কথা তুলে ধরেন তাঁদের লেখনীর মধ্যে দিয়ে।অর্থাৎ দুই লেখকের জীবনবীক্ষা ছিল স্বতন্ত্র।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বাংলা সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রতিফলন অবশ্য তার আগে থেকেই দেখা যায় তারাশঙ্করের রচনায়।সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দিকগুলি তিনি তুলে ধরেছেন।যেমন, জমিদার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য এবং ক্ষয় দুটি দিকই প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তাঁর রচনায়। তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যকে উদ্ধার করা যায়।অর্থাৎ,সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী তত্ত্ব গৃহীত হবার পূর্বেই যেমন টলস্টয়ের সাহিত্যে এই আদর্শ অনুসন্ধান করা হয়েছে,ঠিক এভাবেই তারাশঙ্করের সাহিত্যকেও এই দৃষ্টিতে বিচার করা যেতে পারে।পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল, সাবিত্রী রায়,ননী ভৌমিক,সুশীল জানা প্রমুখ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন।